১০.৪.২ তেভাগা আন্দোলন

বিংশ শতকের সূচনায় অন্যান্য স্থানের মতো বাংলায় রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত নানা কৃষক আন্দোলন ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ক্রমশ সরকারের প্রদেয় খাজনা ও প্রজাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি ছিল ভূস্বামীদের আয় বৃদ্ধির ইঙ্গিত। ক্রমবর্ধমান ভূমিকর ছাড়াও নানা ধরনের কর বেআইনিভাবে আদায় করা হত। জমিদারদের অর্থের চাহিদা ও ফসলের বাণিজ্যিকীকরণ কৃষকদের প্রবল চাপের মধ্যে ফেলে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে করদাতা ও জমিদারদের সম্পর্কের নানা পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে কৃষি কাঠামোর প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমের নদীগুলি ক্রমশ স্রোতহীন হয়ে পড়ছিল অন্যদিকে রেললাইন পেতে ও বাঁধ বেঁধে জমিগুলির ক্ষতিসাধন করা হয়। আবাদি জমিগুলিতে জলের টানে উৎপাদন ব্যাহত, ফলে কৃষকরা মহাজনের কাছে ঋণী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পূর্বাংশে উর্বর পলিমাটির প্রাচুর্য, অত্যধিক বৃষ্টিপাত ইত্যাদির কারণে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল। পশ্চিমে খেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পূর্বের কৃষকরা ছিল অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। কৃষি সমাজের অর্থনীতি ছাড়াও ধর্ম, জাতি ও আনুগত্যের প্রশ্নটিও বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। পূর্ব-উত্তর বাংলায় জমিদাররা ছিল অধিকাংশ হিন্দু আর প্রজারা ছিল মুসলিম, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় কারণ মিলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈরি

রংপুর, মালদা ও জলপাইগুড়ি এলাকায়। তেভাগার দাবিতে বাংলার কৃষকদের আপসের লড়াই একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন ছাড়াও ছিল রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন শ্রেণিসংগ্রাম।[২৭] দিনাজপুর জেলার এটওয়ারি থানার রামপুর গ্রামে প্রথম দেখা গিয়েছিল সংগঠিত তেভাগা আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ, ক্রমশ তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে রংপুর, পাটনা, ঢাকা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, হুগলি প্রভৃতি স্থানে। যদিও অনেকে তেভাগা আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সাম্প্রতিক নানা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে তেভাগা আন্দোলন ছিল একটি সংগঠিত শ্রেণিসংগ্রাম এবং যার শিকড় ছিল জাতীয় আন্দোলনের জমিতে প্রোথিত।[২৮] সমকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা কর্তৃক প্রকাশিত *তেভাগার লড়াই* পুস্তিকার থেকে জানা যায় যে, কৃষক সভা ভাগচাষিদের যে সব দাবিগুলির প্রেক্ষিতে আন্দোলন করার আহ্বান জানায় সেগুলি ছিল :

১. উৎপন্ন ফসলের ২/৩ ভাগ চাষি ও ১/৩ ভাগ পাবে মালিক।
২. ভাগচাষিকে বর্গা থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না এবং জমিতে তার দখলিস্বত্ব দিতে হবে।
৩. এক মন ধানে পাঁচ শের-এর বেশি সুদ নেওয়া যাবে না এবং অন্যান্য প্রথার নামে (বাড়ি, করালি, শুক্তি) শস্য আদায় করা চলবে না।
৪. জমি থেকে উচ্ছেদ করা, খাদ্য মজুত করা এবং ধান থাকলেও ভাগচাষিকে সুদের বিনিময়ে ধার দিতে অস্বীকার করা আইনত অপরাধ।
৫. রশিদ না দিয়ে ভাগচাষির কাছ থেকে ধান আদায় করা চলবে না।[২৯] ইত্যাদি।

এগুলি ছিল কৃষকসভার সর্বনিম্ন দাবি। মধ্যবিত্ত কৃষকরা বাঁচার তাগিদে কৃষি ব্যবস্থার একটি নতুন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কৃষক প্রজারা জমিদারদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে অনেকেই মহাজনদের শরণাপন্ন হয়। ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা ঋণ সালিশি বোর্ডের সাহায্যে পুরোনো ঋণ থেকে খাতক কৃষকদের বাঁচানোর চেষ্টা করলেও মূলগত ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবীরা কৃষক আন্দোলকে গতিশীল করে তোলে। কৃষক সভার দাবিগুলি প্রচারপত্র আকারে জেলার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে দেয়। হাজার হাজার মানুষ প্রাদেশিক কৃষকসভার নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেয়।[৩০] অধ্যাপক সুস্নাত দাশ তেভাগা আন্দোলনের তিনটি পর্যায়ের কথা লিখেছেন। প্রথম পর্বে, তাদের দাবিগুলি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে জনসভা, মিছিল এবং গ্রামে গ্রামে বৈঠক। কৃষকরা অধিকাংশ মুসলমান হওয়ায় লিগের স্থানীয় নেতৃত্ব (আবুল হাসিম, আবুল মনসুর) কৃষকদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বে,

হয়েছিল সামাজিক দূরত্ব। পূর্ব বাংলার কৃষক বিক্ষোভ ক্রমশ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার চেহারা নিতে থাকে। পূর্ব বাংলার কৃষক আন্দোলনে ধর্মের যেমন বিশেষ ভূমিকা রয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষকদের মধ্যে দেখা দেয় জাতি আন্দোলন। এই জাতি আন্দোলনগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ছিল উঁচু জাতে ওঠার প্রচেষ্টা। গান্ধিজির নেতৃত্বে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে কৃষকরা যোগ দিয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের অংশ রূপে। কৃষকদের দাবিদাওয়া ভিত্তিক আন্দোলন বৃহত্তর আকার ধারণ করে পরবর্তীকালে। অবিভক্ত বাংলায় কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন সারা ভারত কৃষকসভা। বিশেষত বাংলার কৃষক সমাজ কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রেণিগতভাবে সংগঠিত হতে শুরু করে। কমিউনিস্টদের দ্বারা তেভাগা আন্দোলন ছিল বাংলার কৃষক আন্দোলনের এক গৌরবময় অধ্যায়।

বাংলার কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তোলে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মহামন্দা। অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরি, সুগত বসু ও পার্থ চ্যাটার্জির মতো গবেষকরা অনুসন্ধানের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ১৯২৮-৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় বাংলার কৃষি ক্ষেত্রে জমির ব্যাপক হস্তান্তর হয়। মন্দার সময় জমির একটি বড়ো অংশ যেমন অকৃষকদের হাতে চলে যায় তেমনি কৃষি উৎপাদনের অন্যতম ফসল ধান ও পাটের আর্থিক মূল্য ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছিল। যদিও ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে (১৯৪০) ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা ৩০ শতাংশ বলা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় গ্রাম বাংলার ৭৫ শতাংশ মানুষেরই জমি ছিল পাঁচ একরের নীচে। মন্দার কিছু দিন পরেই যুদ্ধ এবং মন্বন্তরের সময় ব্যাপক জমি হস্তান্তরিত হয়। এই জমি হস্তান্তরের ফলে অনেক মালিক চাষি বর্গাদারে পরিণত হয়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে মন্বন্তরের সময় ১২ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। দুই কোটি মানুষের জীবন তীব্র সংকটের মুখে পড়ে। পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে মন্বন্তরের প্রভাব ছিল ব্যাপক। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফসল তোলার মরশুমে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রথম তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রায় ১৯টি জেলায় ষাট লক্ষ ভাগচাষি কোনো না কোনোভাবে তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। মন্দা ও আকালের ফলে বাংলার গরিব চাষিরা অনেকেই জমি হারিয়েছিল এবং তারা নেমে আসে ভাগচাষিদের স্তরে। বাংলার জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ পরিণত হয় বর্গাদারে। এই বর্গাদারদের সংগঠিত করতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছাত্র ও যুবকেরা। চাষিরা নিজের খামারে ধান তুলতে চায় এবং অর্ধেকের পরিবর্তে দুভাগ ফসলের দাবি জানায়। উত্তরবঙ্গে বিশেষত দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ মহকুমায় আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ে

ভাগচাষি, বর্গাদার ও খেতমজুররা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ধান কেটে চাষির বাড়িতে তোলার জন্য কৃষকসভার নির্দেশে গড়ে ওঠে ভলান্টিয়ার বাহিনী। বিভিন্ন জেলায় গড়ে তোলা হয় তেভাগা কমিটির। তেভাগা কমিটির উপর দায়িত্ব পড়ে জোতদার ও পুলিশের গতিবিধি লক্ষ রাখা, স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা, মামলা চালাবার জন্য এলাকায় অর্থসংগ্রহ করা, জোতদারদের শাস্তিবিধান করতে প্রয়োজনে বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (অনেকে মুসলিম লিগের সমর্থক) দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকায় বলপূর্বক নিজেদের দাবি মতো ফসলের উপর দখল নিতে শুরু করে। জমিদার ও জোতদাররা প্রশাসনের সমর্থনে পুলিশ বাহিনী নিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ চালায়। দিনাজপুরের কৃষক কর্মী শিবরাম ও সামিরুদ্দিন ছিলেন এই সংগ্রামের প্রথম শহিদ। আন্দোলনের তীব্রতায় বিভিন্ন এলাকা 'মুক্তাঞ্চল' বলে ঘোষিত হয়। স্থানীয় জোতদাররা পালিয়ে যায়, সমান্তরাল প্রশাসন পরিচালনার জন্য গঠিত হয় 'গণকমিটি' এবং বিবাদ মীমাংসার জন্য গড়ে ওঠে, 'গণ আদালত'। পুলিশ ও জোতদারদের গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য কৃষকরা গড়ে তোলে বিশেষ বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে মহিলাদেরও স্থান দেওয়া হয়। আদ্রিয়ান কুপার সংগ্রামের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং কৃষক রমণীদের সংগঠিত হওয়ার বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩১] দিনাজপুরের রাজবংশী কৃষকবধূ জয়মণি, জলপাইগুড়ির পূর্ণেশ্বরী বর্মন, ময়মনসিংহের রাসমণি হাজং প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কৃষক রমণীদের মধ্যে যেসব কমিউনিস্ট নেত্রী সাক্ষরতা প্রসারে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁরাও (মণিকুন্তলা সেন, বীণা সেন, মায়া সান্যাল, কনক দাশগুপ্ত প্রমুখ) আন্দোলনকারী রমণীদের পাশে এসে দাঁড়ান। নাচোল জমিদার পরিবারের গৃহবধূ হয়েও ইলা মিত্র তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং আদিবাসী সাঁওতালদের কাছে 'রানি মা' নামে পরিচিত হন। তেভাগা আন্দোলনের এলাকায় কৃষক চেতনা ও মানবিকতায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। এলাকা জুড়ে কৃষকদের আধিপত্য (Hegemony) প্রতিষ্ঠার লড়াই চলে। নারীদের মধ্যে জাগরণ, উপজাতিদের মধ্যে আলোড়ন এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল সবগুলিই তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। যদিও জাতীয় কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা থেকে তেভাগা আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করা হয় তথাপি এই আন্দোলনের অগ্রগতি সহজে স্তব্ধ করা যায়নি। ঔপনিবেশিক শাসনকালে অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের মতো শ্রেণিসচেতন কৃষক আন্দোলন ইতিপূর্বে ঘটেনি। শুধুমাত্র দিনাজপুরেই ৪০ জন কৃষক নিহত হন, আহত হন ১২০০ জন এবং গ্রেপ্তার হন প্রায় (১০,০০০) দশহাজার মানুষ। অবশ্য অধ্যাপক সুনীল সেন ও সুস্নাত দাশের গবেষণায় কৃষকদের মৃত্যু তালিকা আরও দীর্ঘ। তৃতীয় পর্বে, তেভাগা আন্দোলন

প্রশাসনিক দমননীতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ক্ষমতা হস্তান্তরের জটিল নীতি ইত্যাদির আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও দেশবিভাগের সঙ্গে বাংলাভাগ অনিবার্য হয়ে উঠলে আন্দোলনকারী কৃষকদের মনোবলও দুর্বল হয়ে পড়ে। দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও যশোর এলাকার আদিবাসীরা তীব্র দমননীতি সত্ত্বেও এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। তেভাগা আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ার পশ্চাতে তৎকালীন সাম্প্রদায়িকতায় কলুষিত আবহাওয়ার বিশেষ ভূমিকা ছিল। একদিকে মুসলিম লিগের পাকিস্তানের স্বপ্ন অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। আন্দোলনকারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া নিয়ে সুমিত সরকারও তৎকালীন নেতৃত্বদের (কমিউনিস্ট) কটাক্ষ করেছেন।[৩১] একথা সত্যি যে, সংগঠক রূপে কমিউনিস্টদের মধ্যে দুর্বলতা, ব্যর্থতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। তথাপি তেভাগা কৃষক আন্দোলন ছিল ভারতের কৃষক সংগ্রামে নতুন অভিজ্ঞতা। দেশের আর কোনো অভ্যুত্থানের মধ্যে এতখানি শ্রেণিসচেতনতা দেখা যায়নি। অসমাপ্ত এই আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এলাকা ভেদে চেতনার পার্থক্য আন্দোলনের ছিল একটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব আন্দোলনের গতিকে অনেকখানি দুর্বল করে দিয়েছিল। সংগ্রামের অভিজ্ঞতা মানুষকে দেখিয়ে দেয় যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে শোষকশ্রেণি কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে। সর্বোপরি, তেভাগা আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে নতুন চেতনা ও সংস্কৃতির সূচনা ঘটায় তার হাত ধরে পরবর্তীকালে কৃষকদের মধ্য থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে আবির্ভাব হয় প্রতিভাবান ও যোগ্য নেতৃত্বের।